চরিত্র গঠনে বড়দের ভূমিকা

অসতো মা সদ্গময়

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

চরিত্র গঠনে বড়দের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া

প্রকাশকের নিবেদন

চরিত্র গঠনে মনের প্রভাব অপরিসীম।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ও বিদেশে বহু দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ মানব মনকে নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরাও মানব মনকে নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে 'চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ।' অর্থাৎ চিত্ত নামক নদীর দুটি প্রবাহ ধারা রয়েছে—একটি পাপের ধারা অপরটি পুণ্যের বা কল্যাণের ধারা। অর্থাৎ মানব মনের দুটি ভাব। একটি শুভ ও অন্যটি অশুভ। শুভ ভাব বা শুভ সংস্কার মানুষকে ভালোর দিকে অর্থাৎ সৎ কর্মে প্রবৃত্ত করে, অন্যদিকে অশুদ্ধ ভাব বা অশুভ সংস্কার মানুষকে অসৎ কর্মে নিয়োজিত করে। তাই চরিত্র গঠনের কাজে মনকে চালিত করাই হল প্রধান কাজ।

প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন—'মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—এই হল শিক্ষার আদর্শ।' মনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াটি শৈশব কাল থেকেই শুরু করতে হয়। শিশুমন বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে বাবা-মায়ের। পরবর্তীকালে শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী—সকলের দ্বারাই শিশুমন বিকশিত হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরম মাটিতেই বিভিন্ন ধরণের মূর্তি গড়া যায়। পোড়া মাটিতে নতুন গড়ন হয় না। ঠিক সেই রকম শিশুমনকে সঠিক সময়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তার মানসিক গঠনটিও সুন্দর হয়ে ওঠে।

সৎ শিক্ষা, দেশীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা—প্রতিটি মানুষেরই থাকা উচিত। অভিভাবক ও শিক্ষকদের তাই প্রথম থেকেই এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা জরুরী এবং সেইমত শিশুমনকে ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে, চরিত্র গঠনের কাজে সহায়তা করা দরকার। স্বামীজী বলতেন ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দিলে হবে না; তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এবং দেশীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে। তবেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং সে সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ হয়ে উঠবে।

চরিত্র গঠনে বাবা-মা ও শিক্ষকের ভূমিকা—এই বিষয়ে ইংরেজীতে অনেক বই লেখা হলেও বাংলা ভাষায় এতদিন পর্যন্ত সে রকম কোন ভালো বই লেখা হয়নি। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে ইংরাজীতে 'Parents and Teachers in Value education' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। বইটি সুধীজনের কাছে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছে। বর্তমান বইটি তারই বঙ্গানুবাদ। এই বঙ্গানুবাদের কাজে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদের জন্য এটি লেখা, সেই শিক্ষক ও অভিভাবকদের বইটি কাজে লাগলে বইটির প্রকাশ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

স্বামী দিব্যানন্দ

সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বেলুড় মঠ

অধ্যায় ১ মূল্যবোধ

একটি উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তুলতে হলে, সেই আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল্যবাধ সম্পর্কে সচেতনতা জরুরী। তাই সর্বাগ্রে আমরা মূল্যবোধ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করে নেব।

ক) মূল্যবোধের তাৎপর্য
খ) নৈতিক মূল্যবোধ অভ্যাস করার উদ্দেশ্য
গ) আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ধারণা

[ক] মূল্যবোধের তাৎপর্য

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত একটি গল্পের অবতারণা করে আমরা মূল্যবোধ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। সুপরিচিত গল্পটি এইরকম ঃ একজন বাবু তার চাকরকে বললে, 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি-রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি!' চাকরটি বললে, 'ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও।' সে বললে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।'

বাবু হেসে বললে, 'আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশি, — দেখি ও কি বলে।' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, 'ওহে

এটি নেবে? কত দর দিতে পার?' কাপড়ওয়ালা বললে, 'হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; — তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'ভাই আর-একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে, 'ভাই, আর কিছু বলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে নশো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আরও সে বলেছে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।' তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, 'এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক।' চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বললে, 'একলাখ টাকা দেব।'

গল্পের ব্যঞ্জনাটি সুস্পষ্ট—কোন মহামূল্যবান বস্তুর প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বল্পজ্ঞতা অথবা সঠিক ধারণাই বস্তুটির মূল্যবোধ সম্পর্কে এত বিবিধ তারতম্যের সৃষ্টি করে। বাস্তবিক, আমাদের ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ ঠিক এই রকম ভাবেই জড়িয়ে আছে আমাদের সামগ্রিক জীবন বোধের সাথে। একজন মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণা যখন সীমিততম (অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে দেহ ভিন্ন কিছু ভাবতে পারে না), তখন ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই যেন তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীজাত মূল্যবোধ সেই জিনিসটিকেই মূল্যবান ভাবে যেটি একটি স্থূল ভোগ্য সামগ্রী হবার উপযুক্ত। অপরদিকে, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির জীবনের আনন্দের উৎস সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায়। এইরকম মানুষের মূল্যবোধের নিরিখে স্থূলভোগের গুরুত্ব অতি সামান্যই। আবার, মানুষ যখন তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন নিজের মধ্যে দেবত্বের অনুসন্ধানই হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে সর্বাধিক মূল্যবান। বস্তুত, সর্বোচ্চ এই মূল্যবোধটির আবির্ভাবেই প্রকৃত মনুষ্যজীবনের সূচনা হয়।

১.১ ভারতীয় সংস্কৃতিতে মূল্যবোধ ঃ

মূল্যবোধ বিষয়টির একটি সামগ্রিক রূপ সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে 'পুরুষার্থ' নামক জীবনদর্শনে নিহিত রয়েছে। পুরুষার্থ চারটি হলো—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আমরা এই পুরষার্থ চারটিকেই বিভিন্ন স্তরের মূল্যবোধ হিসেবে দেখতে পারি। এখানে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল্যবোধটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রথম মূল্যবোধটি দিয়ে। ধর্মের কঠোর অনুশাসন ছাড়া ধন-সম্পদ বা ইন্দ্রিয় বাসনার বাঁধনহীন ভোগ মানুষের চরম বিনাশ ডেকে আনে। আবার যখন কোন ব্যক্তির এই দুটি মূল্যবোধের (অর্থ এবং কাম) প্রতি তীব্র অনাসক্তি জন্মায়, তখন সে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ 'মোক্ষ' উপলব্ধি করার জন্য সচেষ্ট হয়। বাস্তবিক মোক্ষ হল পরম আনন্দ, শান্তি এবং স্বস্বরূপের উপলব্ধি।

১.২ মূল্যবোধ ও সদ্‌গুণ ঃ

চরিত্র গঠনের মূল্যবোধ বলতে সাধারণতঃ নৈতিক আদর্শকেই বোঝায়। নৈতিক আদর্শ আমাদের অন্তরের সেই দৃঢ় বিশ্বাস যা উচিত এবং অনুচিতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে দেয়। বাস্তবিক, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ এবং 'নীতিবোধ' কথা দুটি প্রায়শই সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ কোন ব্যক্তির মনের গভীরতর স্তরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তার জীবন ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই ধরনের মূল্যবোধ খুব জরুরী। নৈতিক বলই মানুষকে প্রেম, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। আবার, এই নৈতিক শক্তিই সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব, অহিংসা ও ন্যায়ের মত মূল্যবোধের জন্ম দেয়।

খ নৈতিক মূল্যবোধের উদ্দেশ্য

১.৩ নৈতিক মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের উপায় ঃ

আমাদের মনে রাখা দরকার যে নৈতিক মূল্যবোধ উপায় মাত্র—উদ্দেশ্য নয়। এই মূল্যবোধগুলি অবশ্যই আমাদেরকে উৎকর্ষতা ও পূর্ণতার অনুসন্ধানে প্রেরণা দেয় কিন্তু এগুলি প্রকৃত পূর্ণত্বে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে না। আবার সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যও শুধুমাত্র নৈতিক অনুশাসন মেনে চলাই পর্যাপ্ত নয়। বস্তুত, ধর্মই আমাদের জীবন তথা সমাজের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটায়। এখানে, ধর্ম অর্থে কিছু প্রথা ও আচার-আচরণ নয়—ধর্ম হল আধ্যাত্মিকতা।

প্রসঙ্গত, ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ১৯৪৮-৪৯ সালে গঠিত 'University Education Commission' এর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ সুপারিশটি অনুধাবনযোগ্য ঃ "অনেকেই মনে করেন যে নৈতিকতা ধর্মের স্থান নিতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে বিশ্বস্ততা, সাহস, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের মত মহান গুণগুলি ভাল কিংবা মন্দ দুটি পথেই যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। এই গুণগুলি যেমন একজন সফল নাগরিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য—ঠিক তেমনই একজন দুর্বৃত্ত হওয়ার জন্যও অপরিহার্য! উদ্দেশ্যের মহত্বই একজন মানুষকে মহৎ করে।

আমরা জীবনে কি পথ অনুসরণ করছি বা কিভাবে জীবন কাটাচ্ছি তাই আমাদের সৎ বা অসৎ গুণের পরিচয় দেয়। নৈতিকতার অর্থ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা যদি আধ্যাত্মিক শিক্ষা বাদ দিই তবে সেটি হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।" বাস্তবিক যখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হই তখনই নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলি আমাদের মজ্জাগত হয়।

সুতরাং, মূল্যবোধ হ'ল মূলত সেই উপায় যা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়। এগুলি স্বভাবতই আমাদের অন্তরের দেবত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ-নির্দেশ করে।

। গ । আধ্যাত্মিক উন্নতি

১.৪ আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ঃ

মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই বলে যে আমাদের এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল শরীর-মনের অন্তরালে রয়েছে একটি শ্বাশত সত্তা যেটিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এই অন্তর্নিহিত দেবত্বই আমাদের সমস্ত জ্ঞান, আনন্দ এবং উৎকর্ষতার আকর।

১.৫ আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থ আত্ম-সচেতনতার বিস্তার ঃ

বহু শতাব্দী আগে আমাদের মুনি-ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষের চিন্তাভাবনা, আবেগ, কাজকর্ম ইত্যাদি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার চেতনার স্তর-এর সাথে। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে একজন ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণাটিই নির্ধারণ করে দেয়, সে কিরকম লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইবে।

আমাদের চেতনা যদি শরীর ও মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে জীবন সম্পর্কে এক আত্মকেন্দ্রিক ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অতৃপ্ত বাসনা, মানসিক চাপ ও সংঘাত। কাজেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় হল আমাদের চেতনাবোধ বা আত্মসচেতনতার উন্নতি। এই দেহ-মনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতি।

১.৬ আত্মিক উন্নতি আমাদের নৈতিক জীবনকে কার্যকরী করেঃ

একটি স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক জীবন যাপন নির্ভর করে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর। সত্যি কথা বলতে, একমাত্র আধ্যাত্মিকচেতনার আবির্ভাবেই নৈতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হয়। নৈতিক জীবনযাপন প্রসঙ্গে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে "আমি কেন পবিত্র থাকব? কেন আমি অন্যের মঙ্গল করব?" আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের নিরিখে পূর্বোক্ত প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তরটি হবে—পবিত্রতা ছাড়া আমরা অন্তরের পরিপূর্ণতা ও দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারব না। আর অন্যের উপকার করতে হবে কারণ আমি ও তারা এক। কারণ, সমগ্র বিশ্বে একই চৈতন্য সত্তা অনুস্যূত। বাস্তবিক, এই পৃথিবীতে যে পার্থক্য আমরা দেখি তা শুধু নামে ও রূপে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, এই জগতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের সৃষ্টি থেকে সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি পর্যন্ত—সবার মধ্যেই একত্ব বিদ্যমান। নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতা বহুর মধ্যে এই এক কে খোঁজার প্রচেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে—আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন—সেই সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আমার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি। তোমাতে আমাতে শুধু 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ নহে,—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থে এই 'ভাই ভাই'—ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম বিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬০, অষ্টাদশ সংস্করণ)

১.৭ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেঃ

জগতের একত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা যতই সুস্পষ্ট হয়, ততই ভয়, ঈর্ষা, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি ক্ষতিকারক আবেগগুলি থেকে আমরা মুক্ত হই এবং স্বভাবতঃই আমাদের অন্তরে প্রকৃত সমন্বয়বোধের আবির্ভাব হয়। অন্তরের এই স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি বাইরে প্রকাশ পায় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ বা প্রকৃত সামাজিকবোধের মধ্য দিয়ে। আবার, সবার জন্যে ভালোবাসার প্রকাশ হয় নিঃস্বার্থ সেবা, ধার্মিক উদারতা ও দৃঢ় নাগরিক কর্তব্যবোধের মধ্য দিয়ে। বাস্তবিক, পারস্পরিক সম্পর্কগুলি তখন দেবত্বমণ্ডিত হয় এবং কর্মক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ এবং কর্মকুশলতা ইত্যাদি মূল্যবোধগুলির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেইজন্য যথার্থই ঘোষণা করেছিলেন যে "মানুষের অন্তরের দেবত্বের প্রকাশই হল সভ্যতা।"

১.৮ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সর্বরোগহর মহৌষধঃ

ভারতের জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তিটি হল ধর্ম। যে কোন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এটি হল স্বাভাবিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যের উপর বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে ঃ "প্রত্যেক জাতিরই জীবনের এক একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে— প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটি পৃথক পৃথক সুর দিতেছে। উহাই তাহার জীবনীশক্তি। উহাই তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের

গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ সকল বোঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহাদের সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি—এ-সকল সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক অপেক্ষা আমাদের দেশের সামান্য কৃষক পর্যন্ত এ-সকল তত্ত্বসম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই জন্য শত শত বর্ষের অত্যাচার এবং প্রায় সহস্র বর্ষের বৈদেশিক শাসনের পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০, অষ্টাদশ সংস্করণ) তাই, জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই আধ্যাত্মিক উৎস থেকে জীবনীশক্তি আহরণ করা আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য। বাস্তবিক, যদি আমাদের জাতীয় জীবন আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে সরে যায় তবে সেই জাতীয় বিকাশটি হবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং অনিবার্যভাবে তা সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে ঃ "তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে—সম্পূর্ণ ধ্বংস।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৪, অষ্টাদশ সংস্করণ)

একটি প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শই আমাদের সমস্ত সামাজিক সমস্যার মহৌষধ ঃ "ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমনকি আমাদের দেশের ঘোর

দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪১-৪২, অষ্টাদশ সংস্করণ)

আমাদের সামনে এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ হল আমাদের আধ্যাত্মিক খুঁটিটিকে শক্ত করা। আধ্যাত্মিকতায় আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরসা রাখতে হবে জাতীয় জীবনাদর্শের খাতিরে। যে কোন নতুন ধারণা (তা যেখান থেকেই আসুক না কেন) তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা এই জাতীয় আদর্শের ভাবে সঞ্জীবিত হয়।

১.৯ আত্মিক শক্তিতে বলিয়ান নাগরিকের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ঃ

নৈতিকতার সুদৃঢ় অনুশীলনেই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আমাদের জাতীয় জীবনের ধারাটিকে অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব। আমাদের সমাজের পুনর্গঠন নির্ভর করবে নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। একমাত্র, এই ধরণের পুরুষ ও মহিলারাই দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে বাস্তবায়িত করতে পারবেন এবং জাতীয় পুনর্গঠনের সুমহান কর্তব্যটি পালনে সমর্থ হবেন। সমাজ জীবনের প্রকৃত উৎকর্ষতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুগভীর মন্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য ঃ "সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল।" (বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮, ঊনবিংশতি সংস্করণ)

অধ্যায় ২ আদর্শ চরিত্র হওয়া

আপনার নিজের জীবনটি যাতে আপনার সন্তান বা ছাত্রের কাছে একটি অনুসরণীয় আদর্শ জীবন হয়ে ওঠে, তার জন্য আপনাকে অবশ্যই

ক) জীবনে একটি মহান আদর্শকে ধরে রাখতে হবে এবং

খ) ঐ আদর্শ উপলব্ধি করার পদ্ধতিটি বুঝে তা জীবনে রূপায়িত করতে হবে।

২.১ আদর্শ ছাড়া উন্নতি হয় না ঃ

জীবনে আদর্শ থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিয়ে বলেছেন "যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি হাজারটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে তবে পঞ্চাশ হাজার ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে।" সরল কথায়, একটি উন্নত আদর্শ ভিন্ন জীবনের প্রকৃত উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। সেইহেতু, আপনার জীবনের অভ্রান্ত দিশারী হিসেবে একটি মহান আদর্শ থাকা অত্যন্ত জরুরী। (বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩-৩৪, ঊনবিংশতি সংস্করণ)